ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় লোকজীবন ও প্রেক্ষিত

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিত বিচিত্র চিত্রকল্পে উপস্থাপিত করেছেন কবিরা। বৈচিত্রপূর্ণ এই উপস্থাপন ব্যাপ্তি ও বিকাশে ব্যাপকতর হয়েছে। আধুনিক কবিতার কায়া-নির্মাণে লোকোপাদান বা লোকাভরণ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা এই সময়ের কবিরা প্রমাণ করেছেন। লোকজীবনের ক্ষেত্র থেকে আহৃত লোকোপাদান কবিতার নির্মাণকলার সঙ্গে অন্বিত হয়। বলা বাহুল্য, নির্মাণশৈলীর উপাদান রূপে এই সব লোকোপাদান কবিতা-কায়াকে অলংকৃত ও ভাবময় করে তোলে। বিংশ শতকের অন্ত্যলগ্নে যে সব কবিরা কবিতায় লোকজ উপাদান ব্যবহার করেছেন, প্রয়োগ-দক্ষতায় সেগুলির সবকটিই যে সার্থক তা নয়, তবে যে সব কবিরা তাঁদের কবিতায় লোকচেতনাকে কবি ও পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধনের দ্বারা রসোপলব্ধির স্বক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছেন শুধুমাত্র সেই সব কবিতাই কালোত্তীর্ণ হয়েছে। শৈলী নির্মাণ ও প্রয়োগ দক্ষতায় কবিদের স্বাতন্ত্র্য চিনে নেবার উপায়ও কাব্যশরীরের এই লোকজ উপকরণ।

কবি আল মাহমুদ যখন তাঁর 'সোনালী কাবিন' কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিত হিশেবে ব্যবহার করেন নিচের পংক্তিগুলি-

> "বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
> দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
> লাঙল জোয়াল কাস্তে, বায়ূভরা পালের দোহাই
> হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোনো কবি করে না কসুর।
> কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
> নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা
> রাতের নদীতে বাসা পানিউড়ি পাখির ছতরে,
> শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছলছল।"

তখন কবির লোকজীবন বীক্ষা বাক্য নির্মাণশৈলীর সাথে সার্থকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়।

বৃদ্ধদেব বসু যখন 'গাঁয়ের মেয়ে' কবিতায় বলেন -

" ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল
জাগাবে হাতে পায়ে ভঙ্গি
ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীর ?
ডাকবে উল্লাসে দর্দুর ?
শিশির বিন্দুর আকারে ভরপুর
ঝুলবে আঙ্গিনায় কুমড়ো ....।"

তখন লোকচেতনা কবির বর্ণনা ভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ।

অন্বেষক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কালকেতু ফুল্লরার গল্প' কবিতায় বাংলার লোক-ঐতিহ্য বিশেষ মাত্রা পায় এইভাবে -

"ফুরায় না ফুল্লরার বারমাস্যা
আর
শুণ্য হাতে কালকেতুর ফিরে আসা ।

কবির কবিতায় জড়িত হয়ে থাকে তাঁর সমাজ ও সময় । যে পরিবেশে কবি দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন তাঁর প্রভাব চেতনে-অবচেতনে কবির মনোজগৎকেই শুধু প্রভাবিত করে না, কাব্যকেও করে । সুতরাং কবি-ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে জীবন-প্রেক্ষিত পারিপার্শ্বিকতার এক বিশেষ গুরুত্ব থাকে । জীবনকে বাদ দিয়ে যেহেতু কবিতা হয় না, তাই জীবনের অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ ধরা পড়ে কবিতায় । কবিতাকে সমাজ জীবন-বৃত্তের বাইরে রাখা যায় না । কারণ, কবিতা আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না । কবিতার একটি উৎসভূমির প্রয়োজন হয় । তাই কবিতা জাতীয় জীবন ধারা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না । কবি-জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয় কবিতার মধ্যেই । সমসাময়িক সময় বা সমাজ থেকে কবি বিশ্লিষ্ট হতে পারেন না । ফলে তাঁর রচিত কবিতার শরীরে সমসাময়িক সমাজের ছাপ অবশ্যই থাকে । এরই সাথে যুক্ত হয় অগ্রজ কবিদের থেকে পাওয়া কাব্যিক ঐতিহ্যের পরম্পরা ও সাংস্কৃতিক চেতনা । কবির সংশ্লিষ্ট সমাজের বিশ্বাস,

সংস্কার, ধর্মীয় চেতনা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, রুচি-অভিরুচি, নৃত্য-গীত, সুর-ছন্দ তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত করে। আর এই সব কিছুর সমন্বয়ের সুষম প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় সমাজের জীবন ও কবির মনোজগৎ। তাই কবিতা শুধু কবির ব্যক্তিগত অনুভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাতে থাকে সমকালীন জীবন ও সংস্কৃতির অনুরণন। এইভাবেই কবিতায় আসে লোকজীবন-প্রেক্ষিত।

খ্যাতনামা কবি শামসুর রহমানের একাধিক সময় সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, ইতিহাস চেতনার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ভাব ও বাক্যের সমন্বয়ে। এবার এরই পাশাপাশি ইতিহাস , ভূগোল আর পুরাণের বেড়া পেছনে ফেলে কবি পেয়ে যান তাঁর মায়ের নিঃসীম অনন্তে নিঃসঙ্গ যাত্রাকালে বেদনা-বিমথিত শিল্পময় ভাষা, যার লৌকিক অবস্থান বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না-

"হঠাৎ কবরস্থানে ব্যাকুল কোকিল
ডেকে ওঠে রৌদ্র চিরে, নিঝুম দুপুর
আরও বেশি স্তব্ধতায় সমাহিত। মা'র কবরের
পাশে বসে এবং দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ
মার আদরের মতো প্রশান্তির স্নেহ পাই; মাটি
ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন বুকে টেনে নেয় তাঁকে।

(মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে / শামসুর রহমান)

কবিতা ঘুর্ণিঝড় থামাতে অক্ষম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার বাসিন্দাদের খাদ্য দানে অসমর্থ, কোন রকম ব্যাধি সারানোয় অকেজো। কিন্তু কোনও কোনও কবিতা, এ-কথাও সত্য, ব্যথিত লোকমনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাতে সক্ষম। এমনই একটি কবিতা শামসুর রহমানের 'আসুন আমরা আজ'-

"নদী নালা কিংবা পিয়ালের ডাল শোক নয়,
কচুরিপানাও নয়, বাবুই পাখির বাসা, সর্ষেক্ষেত,
নৌকার নয়ন, ডুরে শাড়ি অথবা নয়ানজুলি

শোক নয়, শোক জানি বাস্তবিক অবয়ব হীন ।
তবু শোক হয়ে যায় অকস্মাৎ অনেক কিছুই ।''

এই কবিতা অত্যন্ত দীপ্তিমান বলেই অনেককেই অনুপ্রাণিত করে, শোকার্তের শোক কিছুক্ষণের জন্যও লাঘব করে । লোক-জীবনের সাথে অন্বিত না হলে কবি এ ধরণের লোক-পরিচিত শব্দবন্ধ নির্মাণে কখনো সক্ষম হতেন না ।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ত্যক্তগ্রহ' কাব্যগ্রন্থের 'এখন কোথায় যাব' কবিতায় রমা ঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের অনুভবে-

''হাওয়ায় হাওয়ায় আজ ছিঁড়ে খায় পৃথিবীর মাটি ঘাস কড়ি,
মানুষেরা ছন্নছাড়া, পাখিরাও হারিয়েছে বাসা ।
এখন কোথায় যাবো, এত রাতে কে দেবে নরম রুটি
কে দেবে পানীয় ?
কারো নাম মনে পড়ছে না ।''

সুধীর বেরা ছিলেন যথার্থ অর্থেই কবি । মানবপ্রীতি তাঁর কবিতার মূল উৎসস্থল । কবিতা রচনায় তিনি কাব্যবিলাসী নন, জীবনধর্মী । লোক-জীবন অনুভবের গভীরতায় কবি যখন তাঁর 'আমি এদেশেই মরব' কবিতায় বলেন -

''আমি সুখ না চেয়ে / বেছে নিলাম-
অভাব দারিদ্র অনাহার-ভরা
এই দুঃখী দুঃস্থ দেশকে
আমার দুখিনী মায়ের চোখের জলের সঙ্গে
আমার চোখের জল মিলিয়ে কাঁদবো ।''

তখন লোক-জীবন অনুভূতির দ্যোতনা কবিতাটিকে এক অনন্য সৌন্দর্য দান করে । কবির কাছে 'দুঃস্থ দেশ' শব্দবন্ধটি 'দুস্থ মানুষের বেদনাবোধ-এর সমার্থক বলেই মনে হয় । মেদিনীপুরের এই কবির 'লগ্ন', 'শাহানা', 'সূর্যরাগ', 'অন্য দিন', 'অভিজ্ঞান', 'জল-জনতা-নারী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে জনজীবনের ব্যথা-বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন ।

বিশ শতকের সাতের দশকে কবি অরুণ মিত্রের 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' ও 'শুধু

রাতের শব্দ নয়' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলেও তিনি ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করেছিলেন 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে কাটান গবেষণা কর্মের জন্য। এই সময়ে ফরাসি গদ্যরীতির কবিতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় (নভেম্বর,১৭) সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে অরুণ মিত্র জানিয়েছেন, 'আসলে আমি কবিতার গোড়া থেকেই পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছিলাম। সেক্ষেত্রে আমার ১৯৪৮-৫১ পর্যন্ত ফ্রান্সের জীবন এবং ফরাসী কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। অবশ্য, চেষ্টাটা তার আগে থেকেই চলছিল। আমি ক্রমশ আর চিৎকার পছন্দ করছিলাম না। উচ্চকণ্ঠ রাজনীতির কবিতা থেকে বদলে নিতে চাইছিলাম আমার উচ্চারণের ভঙ্গি।[১]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'প্রান্তরেখা' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এরপর তিনি 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮) ও 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' (১৯৮৬) কাব্যগ্রন্থের জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

অরুণ মিত্র শুধু নাগরিক কবি নন বলেই তাঁর কাব্য -কবিতায় বার বার ফিরে আসে বাংলাদেশ, জন্মস্থান, পল্লী প্রকৃতি। বার বার তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে মাটির বুকে বিছানো নরম দুর্বা ঘাস, মাঠে মাঠে সবুজ ধানের ওপর বাতাসের হিল্লোল, দোয়েল-ফিঙ্গে পাখির সুর, গ্রাম্য মানুষের সহজ-সরল জীবনচর্যা। ড° অশোক কুমার মিশ্রের ভাষায় 'বার বার তাঁর কবিতায় এসেছে গ্রামের স্বপ্নচিত্র এবং বৈপরীত্যের নিকট সান্নিধ্যে এসে সংঘর্ষে তা খান খান হয়ে যাবার কথা।[২]

স্বপ্নচিত্র ও স্বপ্নভঙ্গের আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটেছে নিচের দুই কবিতাংশে। প্রথমে স্বপ্নচিত্র-

"আম জামের গাঁয়ে চুপি
লাখো হাতের তল্লাস এড়িয়ে চুপি চুপি
আমার স্বপ্নগুলোকে আগলাই।"

(আমার মুখে তাকাও / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

পরে 'সঞ্জীবন' কবিতায় দেশভাগের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের প্রতি কবির ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে-

"আমাদের বনেদি শিকলের জোড় ফেড়ে
বুড়ো বটের অগুন্তি শিকড় দ্বিখন্ড করে
আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল শড়কে ময়দানে।"

ভাঙনের মাটিকে কাছ থেকে দেখলেও তাঁর কবিতার প্রধান সুর হতাশা, আশাবাদ। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে আছে মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম দিয়ে গড়া ভবিষ্যৎ জীবন। এই লোকজীবন প্রেক্ষিতই কবি অরুণ মিত্রকে দিয়েছে অনুভূতির তীব্রতা, ভাবের গভীরতা। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে নন্দন তাত্ত্বিক সৌন্দর্য ও ছন্দ শিল্পের বিরল সুষমা।

নগরাশ্রয়ী বৃত্তের বাইরে আছে বিশাল, ধুসর গ্রামজীবন। শহরের বাইরে যে আর এক জীবন ও দেশ আছে-যাকে শহরের অনেক বাসিন্দাই চেনেন না, তাকে রবীন্দ্রনাথের গোরার মতই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আর এক কবি উপস্থাপিত করেছিলেন। ইনি হলেন জয় গোস্বামী। কবি তাঁর 'প্রত্ন জীব' কাব্যগ্রন্থের দশ সংখ্যক কবিতায় যে মৌমাছির কথা বলেছেন - 'কে গো মৌমাছি' তা গ্রাম-বাংলার নিসর্গ-জগৎ থেকেই আহৃত। আবার কবি যখন তাঁর 'বিবৃতি' কবিতায় গাছের প্রসঙ্গ টেনে আনেন, 'যে গাছকে ধরে দাঁড়াতে শিখেছিলাম / কাটলাম তাকে', তখনও লোক-জীবন প্রেক্ষিতেই শৈলীগত বিশিষ্টতা লাভ করে। 'আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘ বালিকার জন্য রূপকথা' কবিতাতেও কবি জীবনানুভব ও লোক-উপাদানকে শিল্পে রূপায়িত করেছেন এইভাবে-

"লিখতে লিখতে লেখা যখন
সবে মাত্র দু-চার পাতা
হঠাৎ তখন ভূত চাপল
আমার মাথায়-
খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম

ছোট বেলার মেঘের মাঠে
গিয়েই দেখি চেনা মুখ তো
একটিও নেই তল্লাটে।"

অনেকে শিল্পকে আত্ম-সংস্কৃতি বলেন। আমরা বলব কবি-প্রকৃতির উদ্ভাসন। ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যের প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন - criticism of life একজন কবি তাঁর জীবনকে বার বার ব্যবহার করেন নতুন করে। তাঁর অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনাকে মনন-শক্তির বলিষ্ঠতায় ভাষা দেন কবিতায়। জীবনের গভীরতম সত্যকে কবি তাঁর গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত করেন -' The high seriousness which comes from absolute sincerity.' এই জন্যেই বলা হয় কবির মধ্যে যা নেই কবিতায় তা থাকতে পারে না। জয় গোস্বামীর কবিতা প্রসঙ্গে এটাই বড় সত্য। কবিতা সৃষ্টির সময় তিনি নিজেকে নির্জ্ঞান-মনের কাছে হেলিয়ে দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে নিজেকে অনেকাংশে সচেতন অবস্থায় ধরে রাখেন। এ পর্যায়ে তিনি কবিতায় অনেক সচেতন প্রয়োগ নিয়ে ভাবেন। তাঁর অসংলগ্নতা, পারম্পর্যতা, ছন্দ-ভাবনা, বিষয়-ভাবনা - এমন অনেক কিছু নিয়ে ভাবেন এবং সচেতন ভাবেই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। এই সচেতনতাটুকু না থাকলে তাঁর কবিতা হতো অরাজক। তাঁর অধিকাংশ কবিতা পাঠ করলেই বোঝা যায়, কবিতাকে রসবোধের মধ্যে জন্ম দিতে গিয়ে তিনি কতখানি মানসিক -নৈতিক শুদ্ধতায় পরিশীলন ও অনুশীলন করেছেন। এই যাপিত জীবনের মধ্য দিয়েই জয় গোস্বামী গড়তে থাকেন তাঁর সজ্ঞান-নির্জ্ঞান মন। আবার জীবন যেহেতু লোক-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়, কবি তাই তাঁর কাব্যে লোকজীবন-প্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করতে পারেননি কোনো ভাবেই।

মনীন্দ্র গুপ্তের কবিতা চিত্রময়। এই চিত্রময়তা আবার শিল্পিত রূপ লাভ করে বাংলার গাছপালা, পশুপাখি ও লোকজীবন-পরিবেশকে আশ্রয় করে। তাঁর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে লেখা কাব্যগ্রন্থ 'শরৎ মেঘ ও ঘাসফুলের বন্ধু' অথবা ১৯৭৪ সালে লেখা 'মৌ পোকাদের গ্রাম' নামকরণ থেকেই বোঝা যায় কবি গ্রাম-জীবনকে চিত্রকল্প ও চিত্রময়তার সংস্থিতিকে কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর স্মৃতিচিত্রময় একটি কবিতায় দেখি -

''অনেক দিন আগে প্রাচীন অশথের ডালপালায়
জড়িয়ে থাকত চন্দ্রবোড়া সাপের মতো মেঘ।
পলকা সুতোয় মানুষ বেঁধে রেখে আসত তাদের
কামনা সেই গাছে।''

(চন্দ্রোদয়)

এখানে তিনি কোনো কুয়াশার সৃষ্টি করেন নি, সুবোধ্য ও মননগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর অভিজ্ঞতা পূর্ণ শিল্প নির্মাণ। এইখানেই মেদিনীপুরের কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর চিত্রধর্মী মেজাজের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লেখা ('দেশ' 'জুন' / পৃষ্ঠা-৭২) 'মর্মর' কবিতায় বীতশোক যখন লেখেন -

''ঘন্টার মতন বাজে দু-পাশের গাছে গাছে।
নেমে পড়ে দ্রুত ছায়া।
হঠাৎই বৃষ্টি নামে মেঘে।
চা-বাগানে বক ওড়ে।''

লক্ষ করার বিষয়, চার পংক্তিতে পূর্ণ বিরাম-চিহ্ন-যুক্ত চারটি বাক্যে কবির উপলব্ধি শিল্প সম্মতরূপে পল্লবিত হয়ে যায়।

আবু মাশুম অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবি। গ্রামবাংলার বহিঃপ্রকৃতির একাধিক নৈসর্গিক উপাদান মানব-হৃদয়ের সাথে সাদৃশ্যের সূত্রে কিভাবে দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে তার নিদর্শন মেলে তাঁর 'মাউথ অর্গান' কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে-

''ছবির মতো সাজানো একটি চিরহরিৎ গ্রামে
আমি এসেছি একটু আগেই....
এ-গ্রামের প্রতিটি মানুষ প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক
আমি ক্লান্ত হয়ে জল চাইতেই অপূর্ব এক কিশোরী
মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিলো তার রক্তিম ঠোঁটে ;
তারপর ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে দিলো ঝর্ণা-জল

সঙ্গে ঘরে-বানানো একমুঠো আঁখের গুড় ।''

(দেশ, ৭ অক্টোবর, ১৯৮৯)

গ্রামজীবনকে ভালবেসে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় সেদিনের মতো স্বপ্নজীবী রয়েছেন এখনও -

'নৈরাশ্য কোথাও নেই । চোখবুজে শুয়ে আছি
আজ জ্যোৎস্না ঘর ও উঠোন, পথ-যতদূর দেখা যায়,
সবই করেছে প্লাবিত;
লক্ষ্মী হেঁটে হেঁটে যেন চলেছেন গৃহস্থের ঘর থেকে ঘরে,
পদচিহ্ন তাঁর ধরে আছে এই মাটি মমতায় ।'

('মৃত্যুকে হারাতে পারি'/দেশ,
৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ / পৃষ্ঠা-৭৬)

কবির বিশ্বাস, মানুষের প্রাণবন্যাই শুধু পারে একমাঠ ফসলের আশ্চর্য পৃথিবী সৃষ্টি করতে, পারে মৃত্যুকে হারাতে । তাই অস্তিবাদী বিশ্বাসে সুস্থির কবি বলেন, 'চোখ বুজে শুয়ে আছি সখে, পাশ ফিরে ।'

কবি বিভাস রায় চৌধুরীর লেখা 'বাবার পদ্মা' কবিতায় (দেশ, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা -৮১) অতীতের স্বর্ণিল দিনগুলির জন্য মেদুর নস্টালজিয়া ও তার অবসানে আন্তরিক আক্ষেপ ধ্বনিত হয় এইভাবে -

'একেলা মা রান্না করে, উনুনে চড়েছে সাদা ভাত....
দু-তিনটে শালিক আসে লোভে লোভে বাবা ছোঁড়ে মুড়ি.....
'বড়খোকা' ডাকে যেই, আমি নই, পদ্মা ছুটে আসে....
পদ্মা তো বাবার নদী, যে বাবা নৌকো ভালবাসে,
নৌকো ছোটে, বাবা মাঝি, চারিদিকে বড় বড় ঢেউ .....
বাবা হাসে ....পদ্মা হাসে....মাহাত্ম্য জানে না আর কেউ ।
বারান্দায় বকছে বাবা - এ সংসার বেতের জঙ্গল
পদ্মা তীরে হত যদি, বড় খোকা, নৌকো জোড়াতালি

দিয়ে আজও চালাতাম, তুই কবি গেতি' ভাটিয়ালি
পদ্মাতীরে সোনা বাংলাদেশ ।'

কবিতাটিতে বঙ্গ ভঙ্গের প্রচণ্ড বিপর্যয়ের স্মৃতিমেদুর বেদনা পাঠকমনে যেন ধাক্কা দিয়ে যায় । এখানে দেশ হারানোর বিষন্ন অনুভূতি যেন সজীব চরিত্রের সত্তা পায় ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আর এক কবি আবুল বাশার । জীবন -এষণাই যেন তাঁর জীবন ঘোষণা । গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধিতে সুস্থিত থাকার ধ্রুবতা নিয়ে তিনি লেখেন -

আমাদের শাহুচরের দিগন্ত দিগরে
কটু ঘূর্ণিঝড়ে, শাওনের বৃষ্টি শেষে গুমানির জলে
পাখিটা ভেজাত ডানা ।
আর ছিল শষ্যের মরাই কুড়নো
রবিঘ্রাণ নাবাল জমির
হরিয়াল পাখির ডানায় সোনালি চিলের মতো
স্বাধীনতা ছিল,
আকাশে কেঁদে বেড়ানোর দারিদ্র ছিল সমস্ত অম্বরে,
নীলাঞ্চলে ছিল তার সূর্যাস্ত মুগ্ধতা ।
('যন্ত্রে কেটেছে দুটি হাত' দেশ/
১৮, ১৯৯৪ / পৃষ্ঠা-৮১)

কবি হিশেবে আবুল বাশার যেমন জীবনের অনুগত তেমনি জীবনকে প্রকৃতি ও নিসর্গের বিচিত্র আলোছায়াতে পর্যবেক্ষণ করেন । এর মধ্যেই তিনি আত্ম আবিষ্কার করেন । সামাজিক, জৈবিক স্তরের মধ্য দিয়েই ঘটে তাঁর আত্ম উপলব্ধি ।

কবি অমিত চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয় । কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতায় রয়েছে বাইরের জগৎকে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করার প্রবণতা । টুকরো টুকরো দৃশ্য-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা ক্রমশ শিল্প হয়ে উঠে এইভাবে -

'ঝিঝি পোকারা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে

বাঁশের জঙ্গলে ।
ফসল কাটা হয়ে গেছে ফসলের মাঠ
বন্ধ্যা এখন
ঘাসগুলি জন্মাবে না অনেকদিন, জমির শরীরের ঘাম
ধোঁয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে, মনে হচ্ছে
আহত হয়েছে রাত্রির বাতাস, আরও অনেক কিছু-
ধুসর গ্রাম নতমুখে শুশ্রুষা করবে সব ক্ষতের ।[২]

জীবন - ঘনিষ্ঠ এই কবি নিসর্গ প্রকৃতিকে তাঁর কবিতায় হাজির করে যেন মানবতাকেই শেষ স্বীকৃতি দিতে চান । তিনি দেখেন -

'বুড়ো জামরুলের শিকড়টিকে
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে বুভুক্ষু পিঁপড়েগুলো ।'

কিন্তু তাঁর এই শেষ কথা নয়, জায়মানতাই শেষ কথা-'রাত্রির পর রাত্রি পেরিয়ে অব্যয়হীন পথ চলা' (তদেব) ।

শতরূপা সান্যাল তাঁর কবিতায় চতুদর্শীর অন্ধকারে ফিরে যেতে চান না, কারণ জ্যোৎস্না তার চেতনায় ভরে গেছে-

জ্যোৎস্না আমার চেতনায় মেশে
জ্যোৎস্না বৃষ্টি সারা গায় ।
উদাসী বাউল চৈত্রের মাঠে
গান গেয়ে যায় জ্যোৎস্নায় । [৩]

এই জ্যোৎস্না যখন আসে -

'এ শহরে অথবা প্রবাসে
আজ চৈত্র ফাল্গুনের মাসে'
ঠিক তখনই 'বেজেছে ছুটির সাইরেন'

('এতদিন কোথায় ছিলেন' / দেশ,
১৭ এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৯

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে এপার-ওপার বাংলার অসংখ্য কবি যখন নগরকেন্দ্রিক অন্তরের ধ্যানমানস পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন তখন কবিরুল ইসলাম মাটির জীবনকে, লোকায়ত জগৎকে স্বপ্নে-বাস্তবে, অভিমানে-অনুরাগে, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে কবিতার বিষয় বা পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এইভাবে-

'ধান পোতা হয়ে গেছে
ক্ষেতে জল কৃষাণ-কৃষাণী ।'

('দিনে দিনে বাড়ে ঃ বিদায় কোন্নগর)

বাংলা কবিতায় তাঁর প্রাকৃতায়নের ডাকটি এই রকম -

'এক হাজার বছর পরে যদি স্বর্ণযুগ আসে
আমি সেই স্বর্ণযুগে ফিরে আসি-
এই বাংলাদেশ, এই সূর্যের সংসারে ।'

('আমি ঠিক চিনে ঃ 'কুশল সংবাদ')

সত্যিই, 'বাংলার বৃহত্তর পটভূমিতে ফুটে ওঠা বুনো ফুলের মতো প্রাণ ভরিয়ে অবহেলিত বর্গের সাথে, লৌকিক সংস্কৃতির সাথে আমাদের যোগটিকে চিহ্নিত করেছিল'[৪] কবিরুল ইসলামের কবিতা ।

সঠিক অনুষঙ্গে, সঠিক শব্দে কবিতায় ছবির জন্ম দিতে পারেন বিনোদ বেরা-

'বিন্নি ধানের খইয়ের মতো এক মুঠো মেঘ পূবে
মন্থর ভেসে যেতে গেল বনের সবুজে ডুবে ।
গুমোরের বুকে ছোট ডিঙি বেয়ে মাঝিরা যায় হাটে
পুজো আসি আসি সময়ে এবার আউস পেকেছে মাঠে ।'

গ্রামের এই দৃশ্যের সাথে আরেক সুষমামণ্ডিত দৃশ্য-

'করোগেট টিনে ছাওয়া ঘরখানি রূপোর মতন সাদা
ধান বোঝা বয়ে আনছে কিশোর সঙ্গে বাবা ও দাদা
ধান ঝাঁপা বাঁকা আলপথ ধরে কাদের বহুড়ি যায় ।

রাঙা ডুরে শাড়ি গতি বিভঙ্গে রোদ্দুরে ঝলকায়'

(কবিতা ঃ দৃশ্য সুষমা / প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক,
দেশ ঃ ২ ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৪)

সরলতার দিক থেকেও বিনোদ বেরার কবিতা পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছে। কবির যে স্নায়ব বোধি তা জীবনকে স্পর্শ করে অনুভূতির প্রত্যক্ষতা দিয়ে-যাতে রয়েছে লোকায়তের প্রশ্রয় । এক অতি সাধারণ মানুষও বিনোদ বেরা কবিতায় বাস্তব-অস্তিত্বে স্পষ্টতর রূপ লাভ করে এইভাবে-

'সামান্য চাষা, আবেগ প্রবণ, নিম্নগামী স্নেহের দাস,
অতি হাড় হাভাতে অবস্থা-
কত ধানে কত চাল না বুঝে তার বিয়ের সখ হয়েছিল,
ফলে দেখতে দেখতে পাঁচ ছ' কন্যার
বন্যার মতো জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

('ঐ মানুষটি কেমন লড়ে যাচ্ছে' দেশ,
১৮ এপ্রিল, ১৯৮৭/পৃষ্ঠা- ৯৫)

ব্যক্তি মানুষের কথা লিখতে গিয়ে বিনোদ বেরা কখনোই ভাবাবেগের প্রাবল্যে অথবা শব্দের ধ্রুপদী ঐশ্বর্যে গেঁথে কবিতার শব্দ নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। একেবারে কথ্য ভাষায় আটপৌরে জীবনকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন কবিতার 'সত্য জগতে'। একেই তিনি কবির কর্তব্য বলে জ্ঞান করেছেন সারা জীবন।

'আত্মচরিত' কবিতায় কবি রবীন আদক জগতের ছেঁড়াখোঁড়া দৃশ্য দেখেন এইভাবে -

'ঘাসের ওপর একফোঁটা টলটলে শিশির ঃ
আমার শৈশবের অভিমান।
প্রান্তরে বর্শার ফলার মতো রৌদ্র ঃ
আমার চণ্ডাল রাগ
কাকচক্ষু জলের দিঘি দক্ষিণে ঃ

আমার যৌবনের ভালবাসা ।

(দেশ ঃ ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৭)

আর ঠিক তখনই -

'জানালা গ'লে চলে আসতো কোজাগরী আকাশ,
অন্ধকারে আলোর কুঁড়ির মতো ফুটে উঠতো নক্ষত্র ।'

(তদেব)

ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া কবির আর কিছু সম্বল আছে বলে মনেই হয় না । এই অনুভূতিকে মুখের ভাষাতেই কবি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেন বার বার -

'খরগ্রীষ্মের এক মধ্যদিনে মণি-কর্নিকার ঘাটে
ঝাঁকড়া একটা গাছ ছাতা ধরেছিল আমার মাথায়
গাছটার মুখ এখন আর মনে পড়ে না-
এখন স্মৃতি-বিস্মৃতির কুয়াশার ভেতর
শিয়রের টেবিল-ঘড়িটায় কেবলই শুনছি তক্ষকের ডাক ।

(তদেব)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি রবীন আদক নিঃসঙ্গতার বেদনা ও একাকিত্বের বিষাদে বিধুর । এসময়ে তাঁর অনুভব-

'দরজার বাইরে পাপোশে জুতো ঘষছে মৃত্যু
আমি টের পাই ।
ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে হাত বাড়াই করমর্দনের জন্য ।'

(তদেব)

কবি মিহির বিশ্বাস সবুজ কোনো গ্রাম পত্তন করতে চান শহর থেকে দূরে যেখানে-

'নদী না থাকে নাই বা থাকল, আকাশ আয়না
এক তুলে নেব পাতাল থেকে
গ্রীষ্মের তৃষ্ণা মেটাব প্রাণ ভরে
তালরসে, আমনের গন্ধ বুকে দ'হাত

আঁজলা করে চিনে নেব স্বপ্নের বাড়ি ।[৫]

কবির কাছে শহর এক 'জ্যামিতিক অরণ্য' । কবির ইচ্ছে, এই অরণ্য ছেড়ে 'চলো মিশে যাই সে মাটির সবুজ কণিকায়' ।

মিহির বিশ্বাস যেখানে ধানের কথা বলতে গিয়ে 'আমনের গন্ধ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, মেঘ মুখোপাধ্যায় সেখানে 'ধানক্ষেতের সুগন্ধ' আবহ সৃষ্টি করে জীবনকে শিল্পের পরিপূরকতায় ধরে রাখতে চান-

'আমার গাঁয়ের ঘাটের প্রান্ত থেকে আশ্বিনের দিগদিগন্তে ছড়ানো
দিশেহারা আকুলি বিকুলি ধানক্ষেত
আর কী সুগন্ধ মা কী সুগন্ধ
তারপর ঢেউ ঢেউ ঢাকের বাদ্যি বাজনা ঝাঁঝ কাঁসর ।

('ঢেউ ঢেউ সমুদ্র'/দেশ, ১৩ ডিসেম্বর,
১৯৯৭ / পৃষ্ঠা-৭৩)

বীথি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকেও লোকায়ত জীবনের অসংখ্য প্রতীক আসন পিঁড়ি, কাঁসার থালা, কচুর শাক পাবদার ঝোল, কাশফুল, সাঁজের প্রদীপ, তুলসী তলা, পুন্নিপুকুর শুধু কথামালা হয়ে থাকেনি । কারণ কবির জীবন - বৃক্ষের শিকড় লোকায়ত বাংলার মাটির গভীরে প্রোথিত-

তোমার জন্যে আসনপিঁড়ি কাঁসার থালায় অন্ন,
কচুর শাকে ইলিশ মাথা রান্না তোমার জন্য ।
তোমার জন্যে শরৎ আকাশ কাশফুল দোল, দোল ।
তোমার জন্যে সাঁজের প্রদীপ তুলসীতলায় জল
তোমার জন্যে চোখের অসুখ চক্ষে ঝরে জল ।
তোমার জন্যে পুন্নিপুকুর জল সইতে যাই
জলকে দেখি ফাটক আঁটা আকাশে রোশনাই ।[৬]

লোকায়ত ঐতিহ্যের চিরায়ত প্রবাহকে অনুভব করেও কবি বীথি চট্টোপাধ্যায়

যখন বলেন 'তোমার জন্যে চোখের অসুখ' তখন একথা নির্মম সত্য হয়ে উঠে যে আমাদের দুঃখ আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্থ লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম।

কবি সুব্রত রুদ্র তাঁর কাব্য জগতে বার বার এনেছেন লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। 'বুড়ির ঘর' কবিতায় আছে দোল উৎসবের সাথে যুক্ত নেড়াপোড়ার প্রসঙ্গ -

'দোলের দু তিন দিন আগে থেকে চলছে
শুকনো ডালপালা জোগাড় করা
আজ আমাদের নেড়াপোড়া
কাল আমাদের দোল।
খড়, খানিকটা পুরনো চট লম্বা খেজুর পাতা
ঘুরনো বড় বাঁশের টুকরো, বুড়ির ঘরের কাঠামো তৈরী।
পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে
বুড়োবুড়িরা আলু রাঙ্গাআলু সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে আজ।'

(দেশ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯)

কবিতাটির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লৌকিক বিশ্বাস ও লোকসংস্কারের চিহ্ন। এর কারণ, কবির অন্তরে রয়েছে লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। আলোচ্য কবিতাটির নামকরণেই যে লোক-জীবন নিষ্ঠ অনুভূতি তার বিস্তার ঘটেছে সমগ্র কবিতায়।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন ঃ খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় লোকায়ত আবহ সৃষ্টি জোরদার হয়। এক অদ্ভুত সারল্য ও সহজতায় কবি লেখেন 'আমার ঘাতক' কবিতা -

'আয় নদী তীর ঘাস
গরুর হাম্বার সাথে আয়।'

(দেশ, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭৮)

রবীন সুর তাঁর কবিতায় বহির্বাস্তবকে বীক্ষায় জারিত করে উপস্থাপন করেন। সময়ের সাথে জীবনের যে মহাসংযোগ তাকেই তিনি বীক্ষাগত ভূমিতে দাঁড়িয়ে এইভাবে

পাঠক-মনে প্রসারিত করেন -

'জায়গাটার নাম বিরহী
প্রত্নগন্ধ নাম বন্য গ্রামটার ।
হায়, কেউ একবারও ঘুণাক্ষরে কেন যে ভাবেনি
কোন রাধিকার কৃষ্ণ বিষন্ন বাঁশির হাহাকারে
লোকায়ত লোকোত্তর এই গ্রামে আজও বেঁচে আছে,
বিরহী নামের বুক মোচড়ানো বিয়োগান্ত উপাখ্যানে ।'

(বিরহী/দেশ, ১০ জানুয়ারি, ১৯৮৭/পৃষ্ঠা-৮৭)

কবি পার্থসারথি চৌধুরীর অধিকাংশ কবিতা ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল হলেও, ব্যক্তি-সীমার বাইরে এসে তাঁর কবিতা সর্বজনীন চেহারা উপস্থাপিত করে । তাঁর কবিতায় শুধু অভিজ্ঞতা নেই, আছে প্রাণ, যা আবেগে অনুভূতিতে চঞ্চল । তিনি যে মাটির কথা, উদ্ভিদের জীবন-কথা, মেঘ আর কীটপতঙ্গের কথা বলেন তাতে প্রাণের স্পর্শ আছে বলেই তাঁর কবিতা পাঠকের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে । 'জন্ম মাটি' কবিতায় তাঁকে বলতে শুনি-

'যেখানে মাঠের বুকে জলধারা কেটে চলে খেত,
যেখানে ভূমির রসে উদ্ভিদের জীবন ভরেছে,
যেখানে বৃক্ষের দেহে পৃথিবীর সেরা মায়া মাখা,
আকাশে মেঘের খেলা,
ধরাতলে কীট আর পতঙ্গের নিরিবিলি ঘর,
সেখানে মানুষও পারে মাটির শরীরে
ঘর গেঁথে পালিত পশুর সঙ্গে
সত্যনিষ্ঠ চিরকালে জীবন কাটাতে ।'

(জন্মমাটি / দেশ, ১৯ সেপ্টেম্বর,
১৯৮৭/পৃষ্ঠা-১৪)

কবির আক্ষেপ -

'আহা রে পৃথিবী তোর এত শান্তি ফেলি
আমার বিবাগী মূর্খ চির ঘরছাড়া ।'

(তদেব)

কিন্তু কবিপ্রাণের প্রকৃত পরিচয় ঘটে আক্ষেপে নয়, প্রিয় জন্মমাটির প্রতি অকৃত্রিম মমতায়-

'তবুও ছুঁতেই আসি জন্মমাটি,
কুসুমিত বনের কিনারা ।'

কবি মলয় গোস্বামীর 'প্রত্নতত্ত্ব' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় কডওয়েলের একটি বাক্য, 'Poetry cannot be separated from the society '[৭] দোগেছের নিখিল সমাজের এমন এক মানুষ যে শ্রমের বিনিময়েও পেট চালাতে অসমর্থ । আমাদের শহরকেই শুধু নয়, গ্রাম-জীবনকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে 'মিক্সি মেশিনের দিন', 'প্রত্নতত্ত্ব' কবিতায় কবি তা এইভাবে প্রকাশ করেন-

'গৃহস্থের উঠোনে যখন নেমে আসে অপরাহ্ন বেলা
গাছের তলায় যখন বাটিকের রোদ্দুরের খেলা
তখন সজোরে হাঁকে দোগেছের নিখিল ।'

(দেশ / ১৭-১০-১৯৯৮)

গ্রাম-মানুষকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চেয়েছিল নিখিল-

'কাঁধে ঝোলা
তার মধ্যে হাতুড়ি, ছেনি
পায়ে তার চাপাবেড়ে, কালমেঘা, দীনবন্ধুনগর
আরও দূর গোবরাপুর, ঠা ঠা রৌদ্রে ঘোরে সারা দুপুরভর
তন্ন তন্ন করে বেড়ায় ঢোড়ামারা বিল.....
কাটাবেন শি-ই-ই-ই-ল্ ?'

(তদেব)

কিন্তু কেউ ডাকে না তাকে । কারণ -

'প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই পলিপ্যাকে গুঁড়ো মশলা থাকে ।' নিখিল বোঝে না,

'গণ্ডগ্রামে এসে গেছে বিজ্ঞানের দিন, মিক্সি মেশিন আর মশলা ভর্তি ঝাঁ ঝাঁ পলিপ্যাক।' এই যন্ত্রযুগের পরিণাম বড় ভয়ংকর নিখিলের কাছে। সে 'ভেঙে পড়ে নিঃসঙ্গ পুকুরের ঘাটে'। অবেশেষে 'ঘাটের বাঁধানো সানে হাতুড়ি আর ছেনি সংঘাতে/পরপর খোদাই শিলের আল্পনা' এবং সব শেষে সে ঘাটের ওপরেই শুয়ে পড়ে। কবিতার উপসংহৃতি এইরকম-

'রাতের দোগেছে চুপ। শুধুমাত্র ভাঙা ঘরে নিরম্বু বিধবা মা
জীর্ণ বৌমা-কে বলে, "ও বউ, এখনও কেন আসেনা নিখিল ?"

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এই ধরণের বাংলা কবিতায় নিখিলের মতো প্রতীক অথবা প্রতিনিধি চরিত্রের ট্রাজেডি- পাঠে পাঠকের বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। মলয় গোস্বামীর কবিতায় অঙ্কিত সামাজিক পরিবেশ ও সমাজ-চরিত্র শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেদনার সাক্ষী হয়ে থাকে না, পাঠকের মনকেও ভারাক্রান্ত করে। এখানেই নিখিলের যন্ত্রণা, কবির যন্ত্রণা ও মানুষের যন্ত্রণা একাকার হয়ে যায়।

কবিতা যদি শিল্প, শৃংখলিত বিন্যাস হয় এবং যদি সমাজ-চৈতন্যের বিচারে নিরর্থক না হয় তাহলে সেই কবিতায় আমরা নবজীবনের আবহসংগীত শুনি। 'কথা ও কাহিনী ঃ রিমেক' কবিতায় পূর্ণিমা গোস্বামী তাই বলেন-

'আমি মা-র মেয়ে; নতুন গান তৈরি করেছি এখন।
নতুন সুর তৈরি করেছি। আমার মেয়ে বড় হয়ে
এই গানগুলো গাইবে, তার মেয়ে বড় হয়ে এই গানগুলো
ভাববে।'

(দেশ / ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭)

কিন্তু এই যে নব জীবনের সংগীত রচনা, তা-তো শুধু বর্তমানকে স্বীকার করেই নয়, এর পটভূমিতে রয়েছে কোনো এক গাঁয়ের কথা, যেখানে-

'আমার মা রাত চারটেয় উঠে বাবার জন্যে
ভাত রাঁধত, তার আগে অন্ধকারে গোবর ছড়া,
কুটোটা এদিক ওদিক হলেই কাঁপা, সবার পরে

খাওয়া (যদি থাকে), এঁটো বাসন আর সেদ্ধ
কাপড়ের সঙ্গে কীর্তন, শূণ্য এ বুকে খাঁচা
বন্দি টিয়া পাখির সঙ্গে কথা আর বসে থাকত
সারা মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে ।'

(তদেব)

গ্রাম বাংলার নারী-জীবনের যে প্রতিফলন তা 'আমার মা' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সামগ্রিক হয়ে ওঠে । এই চিত্র, বলা বাহুল্য, কোনো প্রগতি-পন্থার কথা বলে না । যেহেতু কবিতা সমাজ-বিচ্ছিন্ন শিল্প নয়, তাই এখানে সাময়িক কালের তাৎক্ষণিক গ্রাম-বাংলার নারী সাম্প্রতিক-সীমারেখা অতিক্রম করে যায় এইভাবে-

'সন্ধ্যায় লাল পেড়ে শাড়িতে বড় ঘোমটা দিয়ে
তুলসী তলায় আঁধার ঘরের প্রদীপ, শাঁখে ফুঁ,
রাতে বাবা ফিরলে বাবার পায়ে তেলের মালিশ;
বাবা তখন আগামী দিনের রোগীদের জন্যে কবিরাজী
বই-এর মধ্যে ব্যথা কমানোর ওষুধ খুঁজছেন ।'

(তদেব)

পূর্ণিমা গোস্বামী আধুনিকতার আঙ্গিকে গ্রাম-বাংলার মধ্যযুগীয় কিছু মূল্যবোধের উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন এই কবিতায় । কিন্তু তাঁর শেষ কথা-

'মা একদিন অন্ধ ভোরে মৃত্যুর গান
নিঃশব্দে করতে করতে দাওয়ায় শুয়ে পড়ল । আর উঠল না ।
আমি কিছুতেই রিমেক করব না ।'

এইভাবে গ্রাম-পরিবেশ প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত পুরোনো গন্ধী, কারয়িত্রী নারী-চরিত্র আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে । লক্ষ্য করার বিষয়, কবিতাটিতে আধুনিকতার আঙ্গিকে একবারও মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা প্রশ্রয় পায় নি ।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় শুধু লোকজীবনের কথা নেই, আছে অসংখ্য লৌকিক বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট উপস্থাপন-

'নিমপাখি ডেকে ওঠে গাছে
বলদের পায়ে পায়ে মাঠে শুয়ে থাকে বছর বিয়োনি
গাভিটির মতো, কাঁকড়া গুগলি আর হেলেদের
মহোৎসব শুরু হয়ে যায়, ভোররাতে ভুলকরে
ডেকে ওঠে ঝিঁ ঝিঁ, কাদা খোঁচা খুঁজে নেয়
সরল পুঁটির আঁশ, ভিজে ভাত নিয়ে আসে নারী
অম্লান রোদ্দুরে,'

(এ ভরা ভাদরে / দেশ, ০২-০১-১৯৯০)

কবিতা মানেই যে শুধু নিসর্গ জগতের শুভ্রতা, কমনীয়তা নয়, সে ব্যাপারে কবির সচেতনতা প্রমাণিত হয় উপরের কবিতাংশে, এই পরিবেশেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তির মতো গ্রামীন তথা লোকায়ত জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে -

'এখন তো বর্ষাকাল
রানা পুকুরের পাড়ে ছিপ হাতে বসে থাকে
পরাণ বৈরাগী, ভিক্ষার খঞ্জনী দুটি তোলা
থাকে ঘরে, এখন তো বর্ষাকাল,
গান লেখে কানাই বাউল ।

(তদেব)

মাটির প্রতি চেতনায় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের যে সব কবি লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতির কাছাকাছি এসে কবিতাকে বাস্তব ও বিষয়-কেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন তুষার ভট্টাচার্য। তাঁর 'ধান কুড়ানি মেয়ে' (দেশ, ২ জুন, ২০০০/ পৃষ্ঠা-৪৬) কবিতায়-

'দীঘল প্রান্তর ছেয়ে আছে হলুদ ধানের শিষে,
নবান্নের গন্ধে জেগে ওঠে কার্তিকের ভোর ।
মেঠো ইঁদুরের সুড়ঙ্গ থেকেই দুই একমুঠো ধান
আঁচলে তুলেছে রোগা ধান কুড়ানি মেয়ে ।
সব কিছুই গ্রাম-জীবনকেন্দ্রিক মৃত্তিকার গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে ।'

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় লোকজীবন প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে ও-পার বাংলার যেসব কবিদের কথা মনে পড়ে তাঁরা হলেন- দাউদ হায়দর, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, ত্রিদিব দস্তিদার, নাসির আহমেদ, হাসান হাফিজ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, অসীম সাহা, অরুনাভ সরকার, অরূপ তালুকদার, আবুল মোমেন, খালেদা এবিদ চৌধুরী, তিতাস চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, দিলীপ দে, দিলারা হাশেম, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, ফারুক আলমগীর, মনজুরে মওলা, ময়ূখ চৌধুরী, মর্তুজা বশীর, মোহনলাল বিশ্বাস, মারুফ রায়হান, মৃদুল গুহ, শান্তা মারিয়া, শামীম আজাদ, শাহবুদ্দিন নাগরী, সাযযাদ কাদির, সুকুমার বড়ুয়া, অনামিকা রেজা রোজী, অঞ্জনা সাহা, আইউব সৈয়দ, আকতার হোসাইন, আজিজুর রহমান আজিজ, আনিসুল হক, আবদুল্লাহ আবুসায়ীদ, আবিদ আনোয়ার, আবু করিম, আল মুজাহিদী, অলকা নন্দিতা, আসাদ মান্নান, আনোয়ার করীম, আতাহার খান, আনোয়ার আহমেদ, আফজল চৌধুরী, ইউসুফ মুহাম্মদ, ইকবাল আজীজ, ইকবাল হাসান, ওবাইদুল ইসলাম, ওয়াহিদ রেজা, কাজী রোজী কামাল চৌধুরী, কাজল শাহনেওয়াজ, কবির হুমায়ূন, গোলাম কিবরিয়া পিনু, জরিনা আখতার, জহিদুল হক, জুলফিকার মাতিন, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, জাহিদ মুস্তাফা, নির্মলেন্দু গুণ, জসিম উদ্দিন মাহমুদ, জাফর আহমদ রশীদ, তুষার দাস, তকান বাগচী, তুষারধন বাপন, দর্পন বড়ুয়া, দিলারা হাফিজ, বীরেন সাহা, বদরুন্নেসা সাজু, নাসিমুদ্দিন শ্যামল, নাসের রহমান, প্রণয় পলিকার্পি রোজারিও, ফেরদৌস নাহার, নাসিমা সুলতানা, ফারুক মাহমুদ, মজিদ মাহফুজ, মাহমুদ কামাল, মিনার মনসুর, মুহাম্মদ সামাদ, মোহাম্মদ শফিক, জাহিদ হায়দার, মুজিবুল হক কবির, মাহমুদ হাসান, ফরিদ কবির, মাসুদ খান, ফকরে আলম, মাসুদ বিবাগী, বদরুল হায়দর, মিলি সুলতানা, মারুফ রায়হান, মিহির মুশাকী, মুজিব ইরম, রবীন্দ্র গোপ, রেজা উদ্দিন স্টালিন, সুজন বড়ুয়া, সৈয়দ আবুল মকসুদ, হালিম আজাদ, সেলিম সারোয়ার, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, দারা মাহমুদ, শিশির দত্ত, সোহেল অমিতাভ, সরকার মাসুদ, রমজান আলী মামুন, রাশেদ রউফ, শিমূল মাহমুদ, সরকার আমিন, রায়তুল্লাহ কাদের, ফাতিমা

তামান্না, সাহনাজ মুন্নী, শৈবাল আদিত্য, শোয়াইব জিবরান, টোকন ঠাকুর. শোয়েব শাহার, সুনীল সাইফুল্লাহ, কফিল আহমেদ,, সুব্রত আগস্টিন গোমেজ, বিষ্ণু বিশ্বাস, অসীম কুমার দাস, রাজা শাহিদুল আসলাম,, খোন্দকার আসরাফ, হেনরি স্বপন, মামুন মিজান, সৈয়দ শাহীন রিজভী, শান্তা মারিয়া, আলফ্রেড খোকন, সাইমন জাকরিয়া, লতিফূল ইসলাম শিবলী, দেওয়ান মিজান, মণীর মীস্মু, মাসুদুল হক, রহমাতুল বারী, আসাদ আমেদ, শামীম রেজা, জাফর মাহমুদ, পাভেল পার্থ, রায়হান রাইন, বাবু আহমেদ, মুহাম্মদ মহসীন, রনজু রাইম, সাইফূল সারনয়েল, সাবেরা তাবাসসুম, শাকিরা পারভীন সুমা, হামীম কামরুল হক, মওদুদ উল হাসান, সৌমিত্র দেব, অনিন্দ্য জসীম, আশরাফ রোকন, রহমান হেনরী, প্রিয়ক রসীদ, মুজিব মেহদী, রেজাউল করিম চৌধুরী, শতাব্দী কাদের, সাইদুর রহমান, অতনু তিয়াস, খালেদ মাহবুব মোর্শেদ, আবুল বাশার সেরনিয়াবাদ, মোহাম্মদ আমজাদ আলী, নাজমুল সামস্ প্রমুখ ।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১. দেশ , ১৭ নভেম্বর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৭ / সুরজিৎ ঘোষকে অরুণ মিত্রের বক্তব্য ।

২. দেশ, ২৬ জুন, ১৯৯১ / পৃষ্ঠা ৩৩ / কবিতা ঃ পথিক - অমিত চৌধুরী ।

৩. দেশ, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯১ / পৃষ্ঠা ৩৯ / কবিতা ঃ আমি হব তোর একতারা- শতরূপা সান্যাল ।

৪. বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড) সম্পাদনা ঃ সুবল সামন্ত / পৃষ্ঠা ১৭৯ ।

৫. দেশ, ১৮ এপ্রিল, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৯৫ / কবিতা ঃ নারে না, চল ফিরে যাই - কবি মিহির বিশ্বাস ।

৬. দেশ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঃ কবিতা তোমার জন্যে - বীথি চট্টোপাধ্যায় / পৃষ্ঠা ২৫ ।

৭. C. Caudwell- The Death of Mythology : Illusion and Reality.